

الله

আল্লাহর আকার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ



রচয়িতা

হাফেজ সাইফুদ্দাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল



ভূমিকা

আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী (সিফাত) সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি এবং তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একত্ববাদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে এবং নৃতাত্ত্বিকতা (তাশবীহ) ও গুণাবলী অস্বীকার (তা'তীল) এর মতো ধর্মতাত্ত্বিক বিচ্যুতি এড়াতে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অপরিহার্য।

আল্লাহর "আকার" (রূপ) আছে নাকি তিনি "নিরাকার" (রূপহীন) – এই নির্দিষ্ট প্রশ্নটি ইসলামী ধর্মতত্ত্বে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং বহুল আলোচিত বিষয়। এই প্রতিবেদনটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই জটিল বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

"আকার" এবং "নিরাকার" শব্দদ্বয় ব্যবহারকারীর অনুসন্ধানে সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে। , এবং এর মতো সূত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই শব্দগুলো প্রায়শই আলোচিত হয় এবং "নিরাকার" শব্দটি প্রায়শই একটি অ-ইসলামী বা আমদানিকৃত ধারণা হিসেবে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। অন্যদিকে, "আকার" শব্দটিও সতর্কতার সাথে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত যদি এটি মানবসদৃশ রূপ বা সীমাবদ্ধতা বোঝায়।

ইসলামী ধর্মতত্ত্বের মৌলিক চ্যালেঞ্জ কেবল সরল অর্থে একটি "আকার" আছে বা নেই তা নিশ্চিত করা নয়, বরং এই নির্দিষ্ট শব্দগুলো আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সূক্ষ্ম ইসলামী বোঝাপড়াকে পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ আল্লাহকে "হাত," "মুখ," এবং "চোখ" এর মতো বিভিন্ন গুণাবলী দ্বারা বর্ণনা করে, একই সাথে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (তাঁর মতো কিছুই নেই)।





এই অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন ইঙ্গিত দেয় যে, আল্লাহর উপর মানব-উদ্ভূত ধারণাগত বিভাগ যেমন "আকার" বা "নিরাকার" আরোপ করা অনিচ্ছাকৃতভাবে নৃতাত্ত্বিকতা বা গুণাবলী অস্বীকারের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী ধর্মতত্ত্ব কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে চায়।

এই শব্দগুলো নিজেই, যেহেতু প্রাথমিক উৎসের বাইরে থেকে এসেছে, তাই ঐশ্বরিক বাস্তবতা ভুলভাবে উপস্থাপন করার ঝুঁকি তৈরি করে। ফলস্বরূপ, এই প্রতিবেদনটিকে কেবল একটি সরল "হ্যাঁ" বা "না" উত্তরের উর্ধ্ব যেতে হবে। পরিবর্তে, এটি সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করবে কেন মূলধারার ইসলামী পণ্ডিতরা এই শব্দগুলো এড়িয়ে চলেন বা কঠোরভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন করেন।

এটি পাঠককে "সিফাত" (গুণাবলী) এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষা এবং "বিলা কাইফ" (কেমন তা না জেনে) এর মৌলিক নীতির দিকে পরিচালিত করবে। এই বিতর্কটি, সূত্রগুলোতে যেমনটি দেখা যায়, প্রায়শই ঐশ্বরিক গুণাবলীকে মানবীয় ধারণাগত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়। এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হল এই সম্ভাব্য বিভ্রান্তিকর শব্দগুলো থেকে আলোচনাকে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রদত্ত খাঁটি ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোর দিকে ফিরিয়ে আনা।

তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহর পরম একত্ব ও অনন্যতা, ইসলামের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই ব্যাপক নীতিটি তিনটি আন্তঃসংযুক্ত মাত্রা নিয়ে গঠিত: তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বের একত্ব, আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে স্বীকার করা), তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাহ (ইবাদতের একত্ব, সকল ইবাদত কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা), এবং তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ব, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অনন্য ও অতুলনীয় হিসেবে নিশ্চিত করা)।





আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে বিশ্বাস, যেমনটি আল্লাহ নিজেই কুরআনে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) সহীহ সুন্নাহতে বর্ণনা করেছেন, তা বিশুদ্ধ ঈমানের একটি অপরিহার্য উপাদান। এই বিশ্বাস কঠোর ধর্মতাত্ত্বিক নির্দেশিকা মেনে চলতে বাধ্য: এটিকে তাহরীফ (শব্দ বা অর্থের বিকৃতি), তা'তীল (গুণাবলী অস্বীকার বা নিষ্ক্রিয়করণ), তাকরীফ (পদ্ধতি বা ধরন বর্ণনা), বা তামহীল (সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বা তুলনা) ছাড়া ধারণ করতে হবে।

এবং এর মতো সূত্রগুলো স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে, আল্লাহর গুণাবলী (সিফাত) সম্পর্কে বিশ্বাস তাওহীদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিশেষত তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের। "নিরাকার" (রূপহীন) শব্দটির প্রত্যাখ্যান এবং "হাত," "মুখ," ইত্যাদি গুণাবলীর স্বীকৃতি কেবল বর্ণনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় নয়,

বরং তাওহীদের পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। যদি আল্লাহকে এমনভাবে সম্পূর্ণরূপে "নিরাকার" হিসেবে কল্পনা করা হয় যা তাঁর স্ব-বর্ণিত সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করে, তবে তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসে তাঁর নিজস্ব প্রকাশনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। বিপরীতভাবে, যদি এই গুণাবলীর স্বীকৃতি নৃতাত্ত্বিকতার (আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা) দিকে নিয়ে যায়,

তবে তাওহীদ একইভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। অতএব, সঠিক ধর্মতাত্ত্বিক ভারসাম্য নিহিত রয়েছে এই গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে তুলনা না করে এবং তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি (বিলা কাইফ) নিয়ে আলোচনা না করে নিশ্চিত করার মধ্যে।

এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিই তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের মূল নির্যাস। এর অর্থ হলো, আল্লাহর "আকার" নিয়ে আলোচনা কেবল - - - - -





শারীরিক উপস্থিতির একটি অগভীর অনুসন্ধান নয়, বরং তাঁর অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং তাঁর অনন্য, অতুলনীয় গুণাবলীর একটি গভীর অন্বেষণ, যা তাঁকে সকল সৃষ্টি থেকে মৌলিকভাবে পৃথক করে।

এই প্রতিবেদনটিকে শুরুতেই এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো স্থাপন করতে হবে। এটি জোর দেবে যে আল্লাহর "আকার" সম্পর্কিত পরবর্তী আলোচনা তাঁর স্ব-প্রকাশনার স্বীকৃতির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, একই সাথে তাঁর পরম অতুলনীয়তা কঠোরভাবে বজায় রাখে। এই মৌলিক বোঝাপড়াটি বিস্তারিত বিশ্লেষণের সময় নির্দেশক নীতি হিসেবে কাজ করবে।

এই প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কিত ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থানকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা, বিশেষত তাঁর "আকার" বা "নিরাকার" সম্পর্কিত প্রচলিত প্রশ্নটিকে সমাধান করা। এটি কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সরাসরি ধর্মগ্রন্থের প্রমাণ পদ্ধতিগতভাবে উপস্থাপন করবে,

এই গুণাবলী বোঝার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি (বিশেষত বিলা কাইফ নীতি) ব্যাখ্যা করবে এবং নৃতাত্ত্বিকতা ও গুণাবলী অস্বীকারের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ ভুল ধারণাগুলো সতর্কতার সাথে স্পষ্ট করবে। এই প্রতিবেদনের পরিধি কঠোরভাবে প্রদত্ত গবেষণা উৎসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যা একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রমাণ-ভিত্তিক এবং প্রামাণিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করবে যা পাঠ্য উৎসগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।

আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী: কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ

এই অংশে কুরআনে ও হাদীসে উল্লিখিত আল্লাহর নির্দিষ্ট গুণাবলী পদ্ধতিগতভাবে তালিকাভুক্ত ও ব্যাখ্যা করা হবে। এই গুণাবলীগুলো প্রায়শই আল্লাহর "আকার" সম্পর্কিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।





সামগ্রিক জোর থাকবে এই গুণাবলীগুলোকে যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেভাবেই নিশ্চিত করার উপর, কঠোরভাবে "বিলা কাইফ" (তাদের ধরন বা "কেমন" তা না জেনে) নীতি মেনে চলা।

আল্লাহর হাত

কুরআন একাধিক আয়াতে আল্লাহর "হাত" (ইয়াদ) এর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, যা তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং সরাসরি সৃষ্টির কাজকে বোঝায়।

- "ফিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আকাশ সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে" (সূরা যুমার ৩৯:৬৭) । এই আয়াতটি কিয়ামত দিবসে সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর পরম আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে।
- "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর" (সূরা ফাতহ ৪৮:১০) , যা গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে করা অঙ্গীকার (বায়'আত) কে নির্দেশ করে, আল্লাহর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা ও অনুমোদনকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে।
- "হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হ'তে তোমাকে কিসে বাধা দিল?" (সূরা ছোয়াদ ৩৮:৭৫) , যা আদম (আ.)-কে আল্লাহর নিজস্ব ও সরাসরি সৃষ্টির অনন্যতা তুলে ধরে।
- একটি হাদীস আল্লাহর অপারিসীম উদারতা বর্ণনা করে: "আল্লাহ তা'আলার হাত সদাসর্বদা পূর্ণ। অবিরাম মুষলধারে বর্ষণকারীর মতো দান কখনও তা কমাতে পারে না।" (মুসলিম) । এটি তাঁর সীমাহীন রিযিক ও অফুরন্ত অনুগ্রহকে জোর দেয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত করে যে, আল্লাহর দুটি প্রকৃত হাত রয়েছে।





কোনো সুস্পষ্ট পাঠ্য প্রমাণ ছাড়া কেবল "ক্ষমতা" বা "অনুগ্রহ" হিসেবে রূপকভাবে ব্যাখ্যা করার যেকোনো প্রচেষ্টাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এমন ব্যাখ্যাকে গুণাবলীকেই বাতিল করার এক প্রকার বিকৃতি (তাহরীফ) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আল্লাহর মুখমণ্ডল

কুরআন আল্লাহর "মুখ" (ওয়াজহ) কে তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, যা তাঁর চিরন্তন অস্তিত্ব, মহিমা এবং দিককে প্রতীকীভাবে প্রকাশ করে।

- "আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা।" **(সূরা বাকারা ২:১১৫)**। এই আয়াতটি আল্লাহর দিক এবং তাঁর সত্তার বাস্তবতার দিক থেকে তাঁর সর্বব্যাপকতা নির্দেশ করে, যার অর্থ হলো যেদিকেই আন্তরিক ইবাদতের জন্য মুখ ফেরানো হোক না কেন, সেদিকেই আল্লাহর দিক রয়েছে।
- "শুধুমাত্র আপনার রবের মহিমাম্বিত ও সম্মানিত মুখমণ্ডলই অবশিষ্ট থাকবে।" **(সূরা আর-রাহমান ৫৫:২৬-২৭)**। এই আয়াতটি আল্লাহর সত্তার চিরন্তন ও স্থায়ী প্রকৃতিকে তুলে ধরে, কারণ অন্য সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে।

আহলে সুন্নাত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর মুখ একটি প্রকৃত গুণ হিসেবে বিদ্যমান, তবে তা কোনো সৃষ্টির মুখের মতো নয়, যা মানবীয় উপলব্ধি ও তুলনার উর্ধ্বে।

আল্লাহর চোখ

কুরআন আল্লাহর "চোখ" (আইনুন) কে এমন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে যা তাঁর অবিরাম পর্যবেক্ষণ, নিখুঁত জ্ঞান এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সুরক্ষামূলক যত্নকে বোঝায়।





- "নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো।" (সূরা আত-তুর ৫২:৪৮)। এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর অবিরাম পর্যবেক্ষণ ও সুরক্ষার আশ্বাস দেয়।
- "যা আমার চোখের সামনেই চলছিলো।" (সূরা কামার ৫৪:১৩-১৪) , যা নূহ (আ.)-এর নৌকার কথা উল্লেখ করে, বন্যার সময় আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধান ও যত্নের উপর জোর দেয়।

যদিও মানব চোখের কথা জাহান্নামের আগুন এড়ানোর প্রসঙ্গে উল্লেখ করে, এটি ঐশ্বরিক গুণাবলীকে অনন্য এবং সৃষ্ট চোখের সাথে অতুলনীয় হিসেবে পার্থক্য করতে সাহায্য করে। আল্লাহর "চোখ" কে একটি প্রকৃত গুণ হিসেবে নিশ্চিত করা হয়, তবে এর ধরন অজানা এবং কোনো সৃষ্ট চোখের মতো নয়।

আল্লাহর পা ও পায়ের গোছা

সহীহ হাদীস কিয়ামত দিবস এবং জাহান্নামের সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে আল্লাহর "পায়ের গোছা" (সাক) এবং "পা" (কাদাম) বর্ণনা করে, যা তাঁর অনন্য গুণাবলীকে আরও নিশ্চিত করে।

- আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে: "যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পায়ের গোছা উন্মোচন করবেন।" (মুসলিম) । এটি কিয়ামত দিবসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নির্দেশ করে যখন আল্লাহ তাঁর পায়ের গোছা উন্মোচন করবেন এবং মুমিনগণ সিজদা করবে।
- আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম আরও অধিবাসী চাইতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাতে তাঁর "পা" (কাদাম) রাখেন, যার ফলে এটি বলবে, "যথেষ্ট, যথেষ্ট!" ।

এই গুণাবলীগুলোকে যেমন আছে সেভাবেই নিশ্চিত করা হয়, নৃতাত্ত্বিক কল্পনা বা তাদের ধরন নিয়ে প্রশ্ন করা ছাড়াই।



আল্লাহর আঙ্গুল

হাদীসে স্পষ্টভাবে আল্লাহর "আঙ্গুল" (আসাবি') উল্লেখ করা হয়েছে যা মানবজাতির হৃদয়ের উপর তাঁর পরম নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁর সৃষ্টির বিশালতাকে নির্দেশ করে।

- "নিশ্চয়ই সকল আদম সন্তানের অন্তর সমূহ একটি অন্তরের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল সমূহের দু'টি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি যেমন ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন।" (মুসলিম) । এটি মানব হৃদয়ের উপর আল্লাহর সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বকে জোর দেয়, তিনি যেমন ইচ্ছা সেভাবেই তাদের পরিচালনা করেন।
- আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ আসমান, জমিন, গাছপালা, পানি এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে তাঁর আঙ্গুলগুলোর উপর রাখেন, যা তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা এবং সকল সৃষ্টিকে ধারণ ও পরিচালনা করার ক্ষমতাকে প্রদর্শন করে।

এই গুণাবলীগুলোকে ঐশ্বরিক বাস্তবতা হিসেবে নিশ্চিত করা হয়, যা মানব আঙ্গুল থেকে স্বতন্ত্র এবং তাদের "কেমন" তা নির্দিষ্ট না করেই বোঝা যায়।

আল্লাহর আরশে সমাসীন হওয়া (ইস্তিওয়া)

কুরআনের অসংখ্য আয়াত আল্লাহর আরশের উপর তাঁর "ইস্তিওয়া" (আরোহণ বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া) কে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত করে, যা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বকে নির্দেশ করে।

- "পরম করুণাময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন" (সূরা হা-হা ২০:৫) । এটি একটি সরাসরি ও স্পষ্ট ঘোষণা।
- "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন।" (সূরা আরাফ ৭:৫৪) । এই আয়াতটি সৃষ্টিকে আরশের উপর তাঁর অবস্থানের সাথে সংযুক্ত করে।
- অন্যান্য সমর্থক আয়াতগুলোর মধ্যে রয়েছে সূরা রাদ ১৩:২, সূরা - -



- ফুরকান ২৫:৫৯, সূরা সাজদাহ ৩২:৪ এবং সূরা হাদীদ ৫৭:৪ ।

"ইস্তিওয়া" ধারণাটিকে তার "কেমন" তা নিয়ে প্রশ্ন না করেই (বিলা কাইফ) নিশ্চিত করা হয়, যা ইমাম মালিক (রা.)-এর বিখ্যাত উক্তি দ্বারা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয় যখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "ইস্তিওয়া জানা, এর ধরন (কাইফ) অজানা, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত, এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব।" । এই নীতিটি আহলে সুন্নাতের সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য ।

আল্লাহর অবতরণ ও আগমন

সহীহ হাদীস আল্লাহর রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সর্বনিম্ন আসমানে অবতরণকে বর্ণনা করে, যা তাঁর নৈকট্য এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রদর্শন করে।

- "আল্লাহ তায়ালা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে কাছের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছে, দোয়া করবে এবং আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছে, আমার কাছে (তার প্রয়োজন) চাইবে এবং আমি তাকে দান করব। কে আছে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করব।" (বুখারী, হাদীস: ১১৪৫) । এই হাদীসটি আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বান্দাদের দোয়ায় সাড়া দেওয়ার ইচ্ছাকে তুলে ধরে।

কুরআন কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর "আগমন" এর কথাও বলে।

- "আর আপনার রব আগমন করবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে।" (সূরা আল-ফাজর ৮৯:২২) । এটি তাঁর চূড়ান্ত বিচারকে নির্দেশ করে।

এই কাজগুলো আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে মানানসই হিসেবে নিশ্চিত করা হয়, কোনো মানবসদৃশ ধরন বা শারীরিক নড়াচড়ার নির্দিষ্ট করার চেষ্টা ছাড়াই ।



আল্লাহর হাসি ও সন্তুষ্টি

সহীহ হাদীসে আল্লাহর "হাসি" (দাহিক) বর্ণনা করা হয়েছে এমন প্রসঙ্গে যা তাঁর বান্দাদের নির্দিষ্ট কাজের প্রতি তাঁর গভীর আনন্দ, অনুমোদন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

- "আল্লাহ তাআলা খুশি হন, হাসেন। অনেক হাদীসে এর উদ্ধৃতি রয়েছে... তবে আল্লাহ বান্দার মতো হাসেন, তা নয়; এমনটা কখনো বিশ্বাসও করা যাবে না। কারণ, তাঁর সঙ্গে কোনো ব্যক্তি, সৃষ্টি বা বস্তুর সাদৃশ্য হয় না। তাই তাঁর হাসি তাঁর শানে যেভাবে শোভনীয়, তিনি সেভাবেই হাসেন।" । এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি স্পষ্ট করে যে, হাসি নিশ্চিত করা হলেও তা মানবীয় হাসির সাথে অতুলনীয়।
- "আল্লাহ তিন ব্যক্তির সঙ্গে হাসেন: এক. ব্যক্তি যখন রাতে (তাহাজ্জুদ) নামাজে দাঁড়ায়, দুই. যখন একদল মানুষ নামাজের জন্য..." । এটি নির্দিষ্ট কাজগুলো তুলে ধরে যা আল্লাহর ঐশ্বরিক আনন্দ নিয়ে আসে।
- মোল্লা আলী কারী (রহ.) ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহর হাসি ব্যক্তির প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি এবং তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করাকে বোঝায়।

এই ঐশ্বরিক হাসি মানবীয় হাসি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং এটিকে কঠোরভাবে "বিলা কাইফ" (ধরণ ছাড়া) হিসেবে বুঝতে হবে।

উপরিউক্ত বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলী যেমন হাত, মুখ, চোখ, পায়ের গোছা, আঙ্গুল, আরশে সমাসীন হওয়া, অবতরণ, আগমন এবং হাসি—এগুলো সবই কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

এই গুণাবলীগুলো যদি মানবীয়, নৃতাত্ত্বিক অর্থে আক্ষরিকভাবে বোঝা হয়, তাহলে তা আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। তবে, একই সূত্রগুলো এবং অন্যান্য সূত্র একই সাথে এবং ধারাবাহিকভাবে কুরআনের ঘোষণা "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (তাঁর মতো কিছুই নেই) [সূরা আশ-শূরা ৪২:১১] এবং "বিলা কাইফ" (কেমন তা না জেনে বা ধরন ছাড়া)



ধর্মতাত্ত্বিক নীতির উপর জোর দেয়। এই সহাবস্থান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এটি নির্দেশ করে যে, যদিও এই গুণাবলীগুলোকে আল্লাহর জন্য বাস্তব এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত হিসেবে নিশ্চিত করা হয়, তবে তাদের প্রকৃতি,

ধরন, বা কেমন তারা বিদ্যমান তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য অনন্য এবং মানবীয় উপলব্ধি বা তুলনার উর্ধ্বে। এটি গুণাবলীকেই অস্বীকার করা নয়, বরং সৃষ্টিকুলের সাথে এর সাদৃশ্য অস্বীকার করা এবং এর সুনির্দিষ্ট ঐশ্বরিক বাস্তবতা উপলব্ধি করার আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করা।

এই অংশটিকে অবশ্যই ঐশ্বরিক গুণাবলীগুলোকে যেমনভাবে পবিত্র গ্রন্থগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করতে হবে। তবে, এই স্বীকৃতির পরপরই ধর্মতাত্ত্বিক সতর্কতা যোগ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি অজানা এবং সৃষ্টির কোনো কিছুই সাথে সম্পূর্ণরূপে অতুলনীয়।

এই সতর্ক উপস্থাপনাটি "বিলা কাইফ" এবং "তাশবীহ" বর্জনের বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন করে। সুতরাং, ইসলামী ধর্মতত্ত্বে আল্লাহর "আকার" বলতে মানব-বোধগম্য বা নৃতাত্ত্বিক আকার বোঝায় না,

বরং একটি ঐশ্বরিক বাস্তবতা বোঝায় যার অস্তিত্ব প্রকাশনার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়, যখন এর সুনির্দিষ্ট ধরন কেবল ঐশ্বরিক জ্ঞানের বিষয় হিসেবেই থাকে।





কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ

গুণাবলী	সংশ্লিষ্ট কুরআন আয়াত (সূরা: আয়াত)	সংক্ষিপ্ত অর্থ/প্রসঙ্গ
হাত	যুমার ৩৯:৬৭	কিয়ামত দিবসে পৃথিবীর উপর আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
হাত	ফাতহ ৪৮:১০	রাসূল (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকারে আল্লাহর প্রত্যক্ষ অনুমোদন।
হাত	ছোয়াদ ৩৮:৭৫	আদম (আ.)-এর অনন্য সৃষ্টিতে আল্লাহর সরাসরি কাজ।
মুখমণ্ডল	বাকারা ২:১১৫	আল্লাহর সর্বব্যাপকতা ও তাঁর সত্তার বাস্তবতা।
মুখমণ্ডল	আর-রাহমান ৫৫:২৬-২৭	আল্লাহর সত্তার চিরন্তন ও স্থায়ী প্রকৃতি।
চোখ	আত-তুর ৫২:৪৮	আল্লাহর অবিরাম পর্যবেক্ষণ ও সুরক্ষা।
চোখ	কামার ৫৪:১৩-১৪	নূহ (আ.)-এর নৌকার উপর আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান।
আরশে সমাসীন	ত্বা-হা ২০:৫	পরম করুণাময় আল্লাহর আরশের উপর অবস্থান।
আরশে সমাসীন	আরাফ ৭:৫৪	সৃষ্টির পর আল্লাহর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
আগমন	আল-ফাজর ৮৯:২২	কিয়ামত দিবসে আল্লাহর চূড়ান্ত বিচার।

হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী ও সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ

হাত	মুসলিম (আবু হুরায়রা রা.)	আল্লাহর সীমাহীন রিযিক ও অফুরন্ত অনুগ্রহ।
পায়ের গোছা	মুসলিম (আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা.)	কিয়ামত দিবসে আল্লাহর পায়ের গোছা উন্মোচন।
পা	বুখারী (আনাস বিন মালিক রা.)	জাহান্নামের পূর্ণতা এবং আল্লাহর পা রাখার ঘটনা।
আঙ্গুল	মুসলিম (আবু হুরায়রা রা.)	মানব হৃদয়ের উপর আল্লাহর পরম নিয়ন্ত্রণ।
আঙ্গুল	বুখারী (আব্দুল্লাহ রা.)	আল্লাহর বিশাল ক্ষমতা ও সৃষ্টির ধারণ ক্ষমতা।
অবতরণ	বুখারী ১১৪৫ (আবু হুরায়রা রা.)	রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সর্বনিম্ন আসমানে আল্লাহর অবতরণ ও দোয়া কবুল।
হাসি	মুসলিম (আবু হুরায়রা রা.)	আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দিষ্ট কাজের প্রতি তাঁর আনন্দ।
হাসি	সহীহ মুসলিম ৩৪৯	শহীদদের প্রতি আল্লাহর হাসি।





"আকার" ও "নিরাকার" বিতর্ক: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

এই অংশে ব্যবহারকারীর অনুসন্ধানে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট পরিভাষাগুলো সরাসরি আলোচনা করা হবে, সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করা হবে কেন "নিরাকার" শব্দটি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের কিছু ধারায় সমস্যাযুক্ত এবং কেন "আকার" ধারণাটি একটি ঐশ্বরিকভাবে অনন্য ও অতুলনীয় অর্থে বোঝা হয়।

"নিরাকার" ধারণার পর্যালোচনা: কুরআন ও হাদীসের আলোকে

ইসলামী ধর্মতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, "নিরাকার" (রূপহীন) শব্দটি কুরআন ও সহীহ হাদীস উভয়টিতেই অনুপস্থিত। এই ভাষাগত অনুপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ইসলামী আকীদা মূলত এই প্রাথমিক উৎসগুলো থেকে উদ্ভূত। বেশ কিছু পণ্ডিত স্পষ্টভাবে যুক্তি দেন যে, "নিরাকার" ধারণা ও শব্দটি ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার দেশীয় অংশ নয়, বরং এটি অন্যান্য সংস্কৃতি বা ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে আমদানিকৃত, বিশেষত হিন্দু সংস্কৃতি থেকে। এটি ইসলামী বিশ্বাসে বিদেশী ধারণাগত কাঠামো প্রবর্তনের বিষয়ে উদ্বেগকে তুলে ধরে।

এবং এর মতো সূত্রগুলো বারবার এবং জোর দিয়ে বলে যে "নিরাকার" (রূপহীন) শব্দটি কুরআন বা হাদীসে পাওয়া যায় না এবং এটিকে একটি "আমদানিকৃত" ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, বিশেষত "হিন্দু সংস্কৃতি" থেকে। এই পর্যবেক্ষণ একটি মৌলিক ভাষাগত ও ধারণাগত বিচ্ছিন্নতার দিকে নির্দেশ করে। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য আরবি পরিভাষা (সিফাত) এর একটি সুনির্দিষ্ট সেট ব্যবহার করে, যেমনটি ঐশ্বরিক গ্রন্থগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। যখন এই ঐশ্বরিকভাবে প্রকাশিত গুণাবলীকে অন্যান্য ধর্মীয় বা দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে ধার করা শব্দ যেমন "নিরাকার" ব্যবহার করে অনুবাদ বা ধারণা করা হয়, তখন ভুল ব্যাখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে।





কিছু দার্শনিক বা ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে "রূপহীন" ধারণাটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি বা কোনো নির্দিষ্ট বাস্তবতার অভাব বোঝাতে পারে, যা আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত অসংখ্য গুণাবলীর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হবে।

অতএব, বিষয়টি কেবল একটি শব্দার্থগত নয়; এটি ধর্মতাত্ত্বিকভাবে গভীর, কারণ এটি আল্লাহর অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং তাঁর স্ব-বর্ণনার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই কারণে, "নিরাকার" এর প্রত্যাখ্যান ইসলামী পণ্ডিতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর (যেমন হাত, মুখ, চোখ, পায়ের গোছা, হাসি) নিশ্চিত প্রকৃতির কারণে উদ্ভূত হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

যদিও এই গুণাবলী অনন্য এবং অতুলনীয়, তাদের স্বীকৃতি একটি ঐশ্বরিক বাস্তবতাকে বোঝায় যা সম্পূর্ণরূপে বৈশিষ্ট্যহীন নয়, যা একটি সত্যিকারের "নিরাকার" সত্তা দ্বারা প্রস্তাবিত হতে পারে।

তবে, এটি স্পষ্টভাবে বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে "নিরাকার" প্রত্যাখ্যান করা আল্লাহর জন্য মানবসদৃশ "আকার" (রূপ) নিশ্চিত করার সমতুল্য নয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, আল্লাহ একটি শরীর (জিসম), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (আ'দা/জাওয়ারেহ), বা এমন কোনো আকার (আকার/সুরত) থেকে চিরপবিত্র যা কোনো সৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ।

প্রতিবেদনটিকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, যদিও আল্লাহ সত্যিই অনন্য এবং সৃষ্টির মতো নন, তবে "নিরাকার" শব্দটি সমস্যাযুক্ত কারণ এর ব্যবহার অনিচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক প্রকাশনায় স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করা গুণাবলীকে অস্বীকার করতে পারে। জোর সবসময় আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে যা প্রকাশ করেছেন তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে, তার উপর থাকতে হবে, ঐশ্বরিক বাস্তবতাগুলোকে এমন বাহ্যিক ধারণাগত কাঠামোর -





মধ্যে ফিট করার চেষ্টা না করে যা অনিচ্ছাকৃত ধর্মতাত্ত্বিক বোঝা বহন করতে পারে। এই পদ্ধতি প্রাথমিক উৎসগুলির প্রতি বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করে এবং ইসলামী আকীদার বিশুদ্ধতা রক্ষা করে।

জান্নাতে আল্লাহর দর্শন: "আকার" ধারণার সমর্থন

আল্লাহর সম্পূর্ণ "নিরাকার" (রূপহীন) হওয়ার ধারণার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি হলো, ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী মুমিনদের জান্নাতে আল্লাহকে দেখার বিশাল সৌভাগ্য লাভ হবে।

"কিয়ামতের দিন প্রত্যেক জান্নাতবাসী আল্লাহ তায়ালাকে স্থায়ী আকৃতিতে দেখতে পাবে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নন।" । এই উক্তিটি সরাসরি দর্শনের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ রূপহীনতা প্রত্যাখ্যানের সাথে যুক্ত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দর্শনকে নিশ্চিত করেছেন, এর স্পষ্টতাকে মেঘমুক্ত দিনে সূর্য বা চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করেছেন । এই উপমাটি দর্শনের স্পষ্টতা ও বাস্তবতাকে জোর দেয়, আল্লাহর রূপকে সূর্য বা চাঁদের সাথে তুলনা করে না।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই দর্শন কোনো নৃতাত্ত্বিকতা (তাহবীহ) বা সীমাবদ্ধতা (তাহদীদ) আল্লাহর প্রতি আরোপিত হওয়া ছাড়াই ঘটবে । ইমাম আবু বকর আল-ইসমাইলী (রহ.) যেমনটি বলেছেন: "মুহাদিসগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখা বিশ্বাস করেন তাঁর দৈহিকতা বা সীমাবদ্ধতা বিশ্বাস না করে। তাদের বিশ্বাস হলো যে, তারা জান্নাতে আল্লাহকে তাদের নিজেদের চোখে দেখবেন যেমনটি তিনি চান, কোনো ধরন ছাড়া।" ।

এবং এর মতো সূত্রগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত করে যে, মুমিনরা জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হবে। উপরন্তু, এবং স্পষ্টভাবে এই বিশ্বাসকে আল্লাহ "নিরাকার" (রূপহীন) নন এমন ধারণার সরাসরি খণ্ডন হিসেবে ব্যবহার করে।





এটি একটি গভীর ধর্মতাত্ত্বিক হেঁয়ালি উপস্থাপন করে: আল্লাহকে কীভাবে দেখা যেতে পারে যদি মৌলিক নীতি হয় "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (তাঁর মতো কিছুই নেই) এবং তিনি শরীর বা সৃষ্টির মতো রূপ থেকে চিরপবিত্র? এই আপাত বিরোধের সমাধান নিহিত রয়েছে "বিলা কাইফ" (কেমন তা না জেনে/ধরণ ছাড়া) নীতির প্রয়োগে।

আল্লাহর দর্শনকে একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা এবং একটি ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে নিশ্চিত করা হয়, তবে এর পদ্ধতি—কীভাবে এটি ঘটে, এতে কী জড়িত, এবং আল্লাহকে "কেমন দেখায়"—তা মানবীয় বুদ্ধির কাছে সম্পূর্ণরূপে অজানা এবং কোনো সৃষ্ট উপলব্ধির সাথে অতুলনীয়। এর অর্থ হলো আল্লাহ একটি ঐশ্বরিক "বাস্তবতা" বা "সত্তা" ধারণ করেন যা উপলব্ধি করা যেতে পারে,

তবে এমনভাবে নয় যা তাঁকে "আকার" বা "শরীর" এর মানবীয় ধারণাগত শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে। আল্লাহকে দেখার কাজটি একটি অনন্য ঐশ্বরিক কাজ, মুমিনদের জন্য একটি উপহার, এবং মানবীয় সংবেদনশীলতার সীমাবদ্ধতার কোনো কাজ নয়। এই সূক্ষ্ম অথচ গভীর পার্থক্যটি তুলে ধরে যে, দর্শনের স্বীকৃতি একটি পরম বা শূন্যবাদী রূপহীনতার (অর্থাৎ, কোনো ঐশ্বরিক বাস্তবতা বা বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি) বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, তবে এটি কোনো সৃষ্ট বা নৃতাত্ত্বিক রূপের স্বীকৃতি নয়।

সুতরাং, এই অংশটিকে দৃঢ়ভাবে জোর দিতে হবে যে, জান্নাতে আল্লাহর দর্শন যদিও তিনি এমনভাবে "নিরাকার" নন যা সমস্ত ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে, তার জন্য জোরালো সমর্থন প্রদান করে, এটি একই সাথে তাঁর পরম অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে শক্তিশালীভাবে সমর্থন করে। এই দর্শন তাঁর বাস্তবতা ও মহিমার একটি প্রমাণ, তবে এটি কোনোভাবেই তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার নৃতাত্ত্বিকীকরণ ঘটায় না।





আল্লাহর গুণাবলী বোঝার মূলনীতি: 'বিলা কাইফ' ও 'তাশবীহ' বর্জন

এই অংশটি প্রতিবেদনের মূল ব্যাখ্যামূলক কাঠামো গঠন করে। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আল্লাহর গুণাবলী বোঝার প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করবে, বিশেষত 'বিলা কাইফ' এবং 'তাশবীহ' এর পরম বর্জনের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোর উপর জোর দেবে।

'বিলা কাইফ' নীতি: ধরণ বা প্রকৃতি নির্ধারণ না করা

'বিলা কাইফ' (অর্থাৎ "কেমন তা না জেনে" বা "ধরণ ছাড়া") নীতিটি আল্লাহর গুণাবলী বোঝার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

এই নীতি নির্দেশ করে যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আল্লাহর গুণাবলীকে তাদের নির্দিষ্ট ধরন, রূপ বা অস্তিত্বের সঠিক বাস্তবতা নিয়ে অনুমান না করে বিশ্বাস করতে হবে। মানবীয় বুদ্ধি সহজাতভাবে সীমাবদ্ধ এবং ঐশ্বরিক কাইফিয়াহ (ধরণ) উপলব্ধি করতে অক্ষম।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর আরশের উপর আল্লাহর "ইস্তিওয়া" (আরোহণ) সম্পর্কিত বিখ্যাত উক্তিটি এই নীতিকে পুরোপুরি ধারণ করে: "ইস্তিওয়া জানা, এর ধরন (কাইফ) অজানা, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত, এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব।"। এই গভীর উক্তিটি কেবল "ইস্তিওয়া" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর সকল গুণাবলীর জন্য একটি সার্বজনীন নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

একইভাবে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) স্পষ্টভাবে আল্লাহর "হাত," "মুখ," এবং "সত্তা" কে "ধরণ ছাড়া (বিলা কাইফ)" বিদ্যমান গুণাবলী হিসেবে নিশ্চিত করেছেন, যার ফলে এমন কোনো ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যা ঐশ্বরিক পাঠ্য প্রমাণ ছাড়া কেবল রূপক অর্থে গুণাবলীকেই বাতিল করবে।





মহান ইমামগণ, ইমাম আহমদ (রহ.) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ.),ও এই নীতি কঠোরভাবে মেনে চলেছেন, প্রকাশিত গুণাবলীকে নিশ্চিত করেছেন এবং তাদের নির্দিষ্ট প্রকৃতি বা ধরণ নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

'তাশবীহ' (সাদৃশ্য) বর্জন: সৃষ্টির সাথে তুলনা না করা

ইসলামী আকীদার একটি মৌলিক নীতি হলো, আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অনন্য, শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুই সাথে অতুলনীয়। এই নীতিকে প্রকাশকারী মৌলিক কুরআনের আয়াতটি হলো "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (তাঁর মতো কিছুই নেই) (সূরা আশ-শূরা ৪২:১১)।

এই নীতি নির্দেশ করে যে, যদিও আল্লাহর "হাত," "মুখ," "চোখ" এবং অন্যান্য গুণাবলী রয়েছে, তবে এই ঐশ্বরিক গুণাবলীকে মানবীয় হাত, মুখ বা চোখের সাথে বা অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তার সাথে কল্পনা বা তুলনা করা যাবে না। এই ধরনের তুলনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহর প্রতি মানবসদৃশ গুণাবলী, রূপ বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করাকে তাশবীহ (নৃতাত্ত্বিকতা) বা তামছীল (সাদৃশ্যকরণ) বলা হয় এবং এটিকে একটি গুরুতর ধর্মতাত্ত্বিক ত্রুটি, শিরকের (বহু-ঈশ্বরবাদ) সমতুল্য বলে মনে করা হয়।

ইমাম গাযালী (রহ.) এর মতো বিশিষ্ট পণ্ডিতরা এটিকে প্রতিমা পূজার সমতুল্য বলে মনে করতেন, জোর দিয়েছিলেন যে আল্লাহকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ একটি শরীর হিসেবে কল্পনা করা কুফরীর একটি রূপ।

আল্লাহর গুণাবলীর একযোগে স্বীকৃতি এবং সৃষ্টির সাথে যেকোনো সাদৃশ্যের পরম বর্জন পরস্পর বিরোধী নয়। বরং, এটি তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বোঝাপড়াকে প্রতিনিধিত্ব করে।



'তাহরীফ' (বিকৃতি) ও 'তা'তীল' (অস্বীকার) থেকে সাবধানতা

- **তাহরীফ (বিকৃতি):** এটি কুরআন ও সুন্নাহতে প্রাপ্ত আল্লাহর গুণাবলীর শব্দ বা মূল, সুস্পষ্ট অর্থ পরিবর্তন করার কাজকে বোঝায়। শাব্দিক বিকৃতির (তাহরীফ লাফযী) একটি উদাহরণ হলো ইস্তিওয়া শব্দে একটি অক্ষর যোগ করে এটিকে ইস্তাওলা (জয় করা) করা। অর্থগত বিকৃতির (তাহরীফ মা'নাবী) একটি উদাহরণ হলো আল্লাহর "হাত" কে কেবল "ক্ষমতা" বা "অনুগ্রহ" হিসেবে ব্যাখ্যা করা, যা কিছু পণ্ডিতের মতে সুস্পষ্ট পাঠ্য প্রমাণ ছাড়া গুণাবলীকেই কার্যকরভাবে বাতিল করে। এটিকে সালাফদের আক্ষরিক বোঝাপড়া থেকে বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- **তা'তীল (অস্বীকার/নিষ্ক্রিয়করণ):** এর অর্থ হলো আল্লাহর গুণাবলীকে তাদের বাস্তবতা বা অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বা খালি করা। ঐতিহাসিকভাবে, মু'তাযিলাদের মতো দলগুলো নৃতাত্ত্বিকতার ভয়ে আল্লাহর অনেক গুণাবলী অস্বীকার করেছিল, যা একটি গুরুতর ধর্মতাত্ত্বিক ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়।

এবং এর মতো সূত্রগুলো ঐশ্বরিক গুণাবলী বোঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিচ্যুতি, বিশেষত তাহরীফ (বিকৃতি), তা'তীল (অস্বীকার), তাকযীফ (ধরণ বর্ণনা), এবং তামহীল (সাদৃশ্যকরণ/নৃতাত্ত্বিকতা) নিয়ে সতর্কতার সাথে আলোচনা করে। এই পরিভাষাগুলো বিচ্ছিন্ন ত্রুটি নয়,

বরং ইসলামী আকীদা থেকে ব্যাখ্যামূলক বিচ্যুতির একটি বর্ণালীকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাশবীহ/তামহীল এক চরম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে আল্লাহকে ভুলভাবে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়, যার ফলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



তা'তীল অন্য চরম প্রান্ত দখল করে আছে, যেখানে আল্লাহর গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বা বাতিল করা হয়, যা তাঁর স্ব-প্রকাশনাকে দুর্বল করে। তাহরীফ (অর্থগত বিকৃতি) হলো তা'তীল এর একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ, যেখানে একটি গুণাবলীর মূল, সুস্পষ্ট অর্থ বিকৃত বা একটি ভিন্ন,

প্রায়শই রূপক, ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়, যা পাঠ্য দ্বারা উদ্দেশ্যকৃত গুণাবলীর প্রকৃত বাস্তবতাকে কার্যকরভাবে অস্বীকার করে। তাকরীফ (ধরণ বর্ণনা) ঐশ্বরিক গুণাবলী কীভাবে বিদ্যমান তা ধারণা করার নিরর্থক প্রচেষ্টাকে প্রতিনিধিত্ব করে,

যা কেবল আল্লাহরই জ্ঞানের বিষয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থানকে একটি "মধ্যপন্থা" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা প্রকাশিত গুণাবলীকে নিশ্চিত করে এবং একই সাথে এই সমস্ত বিচ্যুতিকে সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলে। এটি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে তুলে ধরে: নৃতাত্ত্বিকতায় না পড়ে ঐশ্বরিক বাস্তবতাগুলোকে নিশ্চিত করা এবং গুণাবলীকেই বাতিল না করে মানবীয় সীমাবদ্ধতাগুলোকে অস্বীকার করা।

এই অংশটি প্রতিবেদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি এই বিভিন্ন বিচ্যুতিকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করবে এবং ব্যাখ্যা করবে কেন আহলে সুন্নাতের পদ্ধতিকে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, বিশ্বস্ত এবং খাঁটি ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই কাঠামোটি একটি শক্তিশালী ধর্মতাত্ত্বিক লেন্স সরবরাহ করে যার মাধ্যমে বোঝা যায় কেন "নিরাকার" শব্দটি সমস্যাযুক্ত (কারণ এটি তা'তীল/ তাহরীফের দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকি রাখে) এবং কেন "আকার" একইভাবে সমস্যাযুক্ত যদি এটি তাশবীহ বোঝায়।



আল্লাহর দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকার-আকৃতি থেকে পবিত্রতা: সঠিক ব্যাখ্যা

যদিও হাত, মুখ এবং চোখের মতো গুণাবলীর অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হয়, আহলে সুন্নাত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ চিরন্তনভাবে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ, একটি শারীরিক দেহ (জিসম), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (আ'দা/জাওয়ায়েহ), বা এমন কোনো আকার (আকার/সুরত) থেকে মুক্ত যা কোনো সৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ। এগুলি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, যা সীমাবদ্ধতা, নির্ভরতা এবং নশ্বরতা বোঝায়।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহ.), তাঁর প্রামাণিক আকীদা গ্রন্থে বলেছেন: "আল্লাহ সমস্ত সীমা ও প্রান্ত, সমস্ত শারীরিক অংশ ও অঙ্গ এবং সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির উর্ধ্ব; ছয়টি দিক তাঁকে ঘিরে রাখে না, যেমন অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে ঘিরে রাখে।"। এই উক্তিটি আল্লাহর জন্য কোনো স্থানিক বা দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে জোর দিয়ে অস্বীকার করে।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.), ইমাম তাহাবীর সমসাময়িক,ও নিশ্চিত করেছেন: "আল্লাহ কোনো শরীর নন এবং কোনো বস্তুর অনুরূপ নন।"। আল্লাহর প্রতি একটি শরীর, শারীরিক রূপ বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করাকে অনেক পণ্ডিত কুফরী (অবিশ্বাস) বলে মনে করেন, কারণ এটি সীমাবদ্ধতা, নির্ভরতা এবং সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বোঝায়, যার ফলে তাওহীদ দুর্বল হয়ে পড়ে। ইমাম গাযালী (রহ.) আল্লাহর একটি ধারণাগত শরীরকে প্রতিমা পূজার সাথে তুলনা করেছেন।

ঐশ্বরিক গুণাবলীকে আল্লাহর জন্য অনন্য বাস্তবতা হিসেবে নিশ্চিত করা হয়, যার সঠিক প্রকৃতি আমাদের কাছে অজানা (বিলা কাইফ), এবং যা সৃষ্টিতে কোনো কিছু থেকে মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র। এগুলিকে মানবীয় উপমা দ্বারা বোঝা যাবে না।

আল্লাহর গুণাবলী বোঝার মূলনীতি: পরিভাষা ও ব্যাখ্যা

পরিভাষা	সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা	আকীদায় তাৎপর্য/প্রভাব
বিলা কাইফ (بلا كيف)	আল্লাহর গুণাবলীকে তাদের ধরন বা পদ্ধতি (how) নিয়ে প্রশ্ন না করে বিশ্বাস করা।	মানবীয় উপলব্ধি ও তুলনার উর্ধ্বে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যতা বজায় রাখে।
তাশবীহ (تشبيه)	আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তুলনা করা বা সাদৃশ্য করা।	কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; শিরক ও কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে পারে, তাওহীদকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
তাহরীফ (تحريف)	আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কিত কুরআনের শব্দ বা তাদের মূল অর্থ পরিবর্তন করা।	গুণাবলীকে অস্বীকার বা বিকৃত করে, সালাফদের পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতি ঘটায়।
তা'তীল (تعطيل)	আল্লাহর গুণাবলীকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা বা তাদের বাস্তবতা বাতিল করা।	আল্লাহর স্ব-প্রকাশনাকে অস্বীকার করে, ঈমানের মৌলিক ভিত্তি দুর্বল করে।
তাকযীফ (تكيف)	আল্লাহর গুণাবলীর নির্দিষ্ট ধরন বা প্রকৃতি বর্ণনা করার চেষ্টা করা।	মানবীয় বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে অসম্ভব, বিদ'আত হিসেবে বিবেচিত।
তামছীল (تمثيل)	আল্লাহর গুণাবলীর জন্য উপমা বা উদাহরণ পেশ করা যা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।	তাশবীহের একটি রূপ, আল্লাহর অতুলনীয়তাকে অস্বীকার করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা

এই অংশটি মূলধারার ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থানকে একত্রিত করবে, পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য এবং আল্লাহর গুণাবলী বোঝার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির উপর জোর দেবে।

সালাফ ও খালাফদের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সালাফ (ধর্মপ্রাণ প্রথম প্রজন্ম, যার মধ্যে রাসূলের সাহাবীগণ এবং তাদের তাৎক্ষণিক উত্তরসূরীরা অন্তর্ভুক্ত) এবং খালাফ (পরবর্তী প্রজন্মের পণ্ডিতগণ) উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও উভয় দলই আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে একই মূল আকীদা পোষণ করে, তবে কিছু ধর্মতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য ছিল।



সালাফদের পদ্ধতি মূলত তাফবীদ (অর্থের দায়িত্ব অপর্ণ) এবং ইহবাত (ধরণ ছাড়া নিশ্চিতকরণ) এর উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা আল্লাহর গুণাবলীকে কুরআন ও সুন্নাহতে যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেভাবেই নিশ্চিত করতেন,

"কেমন" তা নিয়ে প্রশ্ন না করে (বিলা কাইফ) এবং সাধারণত রূপক ব্যাখ্যায় (তা'বীল) জড়িত না হয়ে, যদি না অন্যান্য সুস্পষ্ট পাঠ্য দ্বারা স্পষ্টভাবে সমর্থিত হয়। তাদের জোর ছিল বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ এবং অনুমানমূলক আলোচনা এড়ানোর উপর।

কিছু খালাফ পণ্ডিত, বিশেষত আশ'আরী ও মাতুরিদীগণ, মু'তাযিলাদের মতো দলগুলোর দার্শনিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে নির্দিষ্ট গুণাবলীর জন্য তা'বীল (রূপক ব্যাখ্যা) গ্রহণ করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে নৃতাত্ত্বিকতায় (তাশবীহ) পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে।

তবে, এটি উল্লেখযোগ্য যে, আশ'আরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী নিজেই জীবনের শেষ দিকে সালাফদের পদ্ধতিতে ফিরে এসেছিলেন বলে জানা যায়, যেমনটি তাঁর পরবর্তী গ্রন্থাবলীতে প্রমাণিত।

এবং এর মতো সূত্রগুলো আশ'আরী/মাতুরিদী পদ্ধতির তা'বীল (রূপক ব্যাখ্যা) নিয়ে আলোচনা করে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী তাঁর জীবনের শেষ দিকে সালাফদের পদ্ধতিতে ফিরে আসার কথা উল্লেখ করে। এটি আহলে সুন্নাহ ঐতিহ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ ধর্মতাত্ত্বিক বিকাশকে প্রকাশ করে। কিছু খালাফ পণ্ডিতের দ্বারা তা'বীল গ্রহণ করা প্রায়শই বাহ্যিক দার্শনিক চাপ (যেমন গ্রীক দর্শন) এবং সাধারণ মানুষকে নৃতাত্ত্বিকতা থেকে রক্ষা করার একটি কৌশলগত প্রতিক্রিয়া ছিল। তবে, ইমাম আশ'আরীর মতো ব্যক্তিদের - -





পরবর্তী পরিবর্তন এই স্বীকৃতিকে নির্দেশ করে যে সালাফদের পদ্ধতি—গুণাবলীকে যেমন আছে সেভাবেই নিশ্চিত করা, তাদের ধরণ নিয়ে প্রশ্ন না করা বা সৃষ্টির সাথে তুলনা না করা—শেষ পর্যন্ত ঐশ্বরিক গ্রন্থগুলির মূল, সুস্পষ্ট অর্থের প্রতি আরও শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত ছিল।

এই পদ্ধতি অতিরিক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐশ্বরিক গুণাবলীকে সূক্ষ্মভাবে অস্বীকার বা বিকৃত করার সম্ভাব্য বিপদ এড়িয়ে চলে। এই ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রমাণ করে যে, তাওহীদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও, আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁর পরম অতুলনীয়তার প্রতি মূল বিশ্বাস প্রজন্মজুড়ে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। "মধ্যপন্থা" শেষ পর্যন্ত এমন একটি পদ্ধতিতে একত্রিত হয়েছে যা নৃতাত্ত্বিকতা এবং গুণাবলী অস্বীকার উভয় চরমকে এড়িয়ে চলে।

আহলে সুন্নাতের সামগ্রিক ঐকমত্য, সালাফ এবং খালাফ উভয় ক্ষেত্রেই, প্রকাশিত গুণাবলীকে নিশ্চিত করা, সৃষ্টির সাথে যেকোনো সাদৃশ্যকে অস্বীকার করা এবং তাদের ধরণ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা। ঐতিহাসিক পার্থক্যগুলো মূলত তাওহীদকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিতে ছিল, মূল বিশ্বাসে নয়। উভয় পদ্ধতিই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যতাকে সমুন্নত রাখতে চেয়েছিল।

আল্লাহর গুণাবলী প্রমাণের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একটি স্বতন্ত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি বজায় রাখে, যা দুটি ধর্মতাত্ত্বিক চরমপন্থার মধ্যে সতর্কতার সাথে চলে: মু'আত্তিলা (যারা আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার বা বাতিল করে) এবং মুশাব্বিহা (যারা আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে, যার ফলে নৃতাত্ত্বিকতা বা তামছীল-এ পতিত হয়)।





তাদের পদ্ধতি হলো আল্লাহর কিতাবে (কুরআন) এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সহীহ সুন্নাহতে আল্লাহ নিজের জন্য যে সকল গুণাবলী আরোপ করেছেন, সেগুলোকে নিশ্চিত করা। এই স্বীকৃতি এমনভাবে করা হয় যা আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সত্যই মানানসই, কঠোরভাবে তাহরীফ (বিকৃতি), তা'তীল (অস্বীকার), তাকযীফ (ধরণ বর্ণনা), বা তামহীল (সাদৃশ্য উপস্থাপন) ছাড়া।

এছাড়াও, আহলে সুন্নাতে পণ্ডিতরা প্রকাশনায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নয় এমন বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক থাকেন এবং নীরবতা অবলম্বন করেন, যেমন আল্লাহর "শরীর" (জিসম) আছে কিনা বা তিনি "দিক" (জিহা) দ্বারা সীমাবদ্ধ কিনা। তারা এই ধারণাগুলোকে নিশ্চিত বা অস্বীকার করেন না, যদি না এই শব্দগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও অতুলনীয়তার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী নীতির সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ না হয়।

উপসংহার

এই প্রতিবেদনটি সতর্কতার সাথে প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অসংখ্য মহিমাম্বিত গুণাবলী (সিফাত) ধারণ করেন যা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ও নিশ্চিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হাত, মুখ, চোখ, পায়ের গোছা, হাসি, আরশের উপর আরোহণ (ইস্তিওয়া) এবং সর্বনিম্ন আসমানে অবতরণ।

ইসলামী আকীদার একটি কেন্দ্রীয় নীতি হলো যে, এই ঐশ্বরিক গুণাবলী বাস্তব এবং কেবল আল্লাহরই জন্য। তবে, তাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অনন্য, শ্রেষ্ঠ এবং সৃষ্টির কোনো কিছু থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। মানবীয় বুদ্ধি তাদের ঐশ্বরিক বাস্তবতা বা ধরণ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। প্রতিবেদনটি স্পষ্ট করেছে যে, "নিরাকার" (রূপহীন) শব্দটি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সমস্যাযুক্ত কারণ এটি প্রাথমিক উৎসগুলোতে (কুরআন ও সুন্নাহ) পাওয়া যায় না এবং যদি ভুল বোঝা হয়, তবে তা আল্লাহর স্পষ্টভাবে





নিশ্চিত করা গুণাবলীকে অস্বীকার বা বাতিল করার দিকে নিয়ে যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, সম্পূর্ণ রূপহীনতার ধারণা প্রত্যাখ্যান করার সময়, আল্লাহর গুণাবলী নিশ্চিত করা কোনোভাবেই তাঁকে মানবসদৃশ "আকার" (রূপ) বা শারীরিক দেহ আরোপ করে না। আল্লাহ সৃষ্টির সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে চিরপবিত্র, তাঁর) "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ": যেমনটি কুরআনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে মতো কিছুই নেই)।

আল্লাহর গুণাবলী বোঝার সঠিক পদ্ধতি, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত দ্বারা সমর্থিত, তাতে 'বিলা কাইফ' (কেমন তা না জেনে বিশ্বাস করা) নীতির কঠোর অনুসরণ এবং 'তাহবীহ' (সৃষ্টির সাথে তুলনা), 'তাহরীফ' (অর্থের বিকৃতি), এবং 'তা'তীল' (গুণাবলী অস্বীকার) কঠোরভাবে বর্জন করা জড়িত।

এবং এর মতো সূত্রগুলো আল্লাহর গুণাবলী ভুল ব্যাখ্যার গুরুতর পরিণতি, যেমন কুফর (অবিশ্বাস) এবং শিরক (বহু-ঈশ্বরবাদ) এর উপর ধারাবাহিকভাবে জোর দেয়। ইমাম তাহবীর উক্তি স্পষ্টভাবে আল্লাহকে মানবীয় গুণাবলী দ্বারা বর্ণনা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, এটিকে কুফর বলে গণ্য করে। ইমাম গাফালীর মত আল্লাহকে একটি শরীর হিসেবে কল্পনা করাকে প্রতিমা পূজার সাথে তুলনা করে।

এটি প্রমাণ করে যে, "আকার" এবং "নিরাকার" সম্পর্কিত ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক কেবল একটি একাডেমিক অনুশীলন নয়। এটি একজন মুসলমানের বিশ্বাস, তাদের ইবাদতের কাজ এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তির জন্য গভীর ব্যবহারিক প্রভাব ফেলে। আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ভুল বিশ্বাস একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুশীলন এবং ঐশ্বরিক সত্তার সাথে সম্পর্ককে মৌলিকভাবে বাতিল করতে পারে। "সঠিক আকীদা" এর উপর ধারাবাহিক জোর কেবল একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পছন্দ নয়,





বরং ইসলামের মূল ভিত্তি অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি এবং বাহ্যিক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান। এটি তুলে ধরে যে, কেন ইসলামী পণ্ডিতরা ইতিহাস জুড়ে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে অনুমোদিত বিশ্বাসের সীমা নির্ধারণে এত সতর্ক এবং কঠোর ছিলেন।

অতএব, এই প্রতিবেদনের উপসংহারে এই ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ের গুরুত্ব এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রতিষ্ঠিত, ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির কঠোর অনুসরণের পরম প্রয়োজনীয়তা কার্যকরভাবে তুলে ধরতে হবে। এই অনুসরণ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক স্পষ্টতার জন্যই নয়, বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের আধ্যাত্মিক অখণ্ডতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।



সমাপ্ত

